প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - III (Sociological Thought)
Module-IV : The Indian Sociological Thinkers

প্রথম মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - III (Sociological Thought)
Module-IV : The Indian Sociological Thinkers

: Board of Studies :
Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences,
Netaji Subhas Open University (NSOU)

Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt. of Sociology,
University of Calcutta

Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology,
University of Calcutta

Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology,
Presidency University

Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology,
Vidyasagar University

Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

: Course Writer :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Course Editor :
Dr. Kum Kum Sarkar
Associate Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this Study material be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University.

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Paper - III (Sociological Thought)
Module-IV : The Indian Sociological Thinkers

বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) 7-29

বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)

১. ভূমিকা

১.১ সরকারবাদ : এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

২. তথ্য পর্যালোচনা : সাম্প্রতিক গবেষণা

৩. জীবনী

৪. ভারতের ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ **(Interpretation of Indian tradition)**

৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য

৫.১. 'ভারত' ও 'হিন্দু' এক অপরের পরিপূরক

৫.২. প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনৈক্যের মূল কারণ শিল্প বিপ্লব

৬. পদ্ধতিগত সমস্যা

৭. প্রত্যক্ষবাদ **(Positivism)**

৭.১ ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতি

৮. হিন্দু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুরীয় এবং প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণ

৮.১ হিন্দু সাহিত্যে প্রত্যক্ষবাদের ছাপ

৯. ব্যক্তিত্ব **(Personality)**

৯.১ ব্যক্তিত্বের নিরন্তর গতিময়তা

৯.২ ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন মসৃণ প্রক্রিয়া নয় ঃ সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতার গুরুত্ব

১০. প্রগতি **(Press)**

১০.১ প্রগতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত

১০.২ প্রাক্-ব্রিটিশ সমাজে প্রগতির স্পষ্ট উপস্থিতি

১০.৩ ব্যক্তিত্ব ও প্রগতি

১১. উপসংহার

১২. অনুশীলনী

১৩. রেফারেন্স/গ্রন্থপঞ্জী

D/Barun-2020/Netaji Subhas Open University/Introducing Sociology/Movel-IV/3rd Proof/05.04.22/7

১. ভূমিকা

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার এমন এক প্রবর্তক ছিলেন যাঁর গবেষণা ও কাজ ভারতীয় সামাজতত্ত্বকে ব্যাপক ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে নিযুক্ত একটি দেশকে তিনি বৌদ্ধিক দিক থেকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সমাজতত্ত্বের জগতে ভারতকে সমস্যাময় প্রতিক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। এই অর্থে দেখলে সরকারের সমাজতত্ত্ব, ভারতীয় সভ্যতার আত্মিক ক্ষমতা সন্ধানের খোঁজে এক সুদীর্ঘ তাত্ত্বিক অন্বেষণ, যা দীর্ঘ সময় ধরে তিনি চালিয়ে গেছেন। বৃহত্তর সমাজের কাছে সরকার পরিচিত ছিলেন ভারতবর্ষের "সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত" হিসাবে (বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০১২: ১৯১). তাঁর স্নেহের ছাত্র, সহকর্মী, সামাজিক কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবিদের কাছে তিনি এক নতুন দর্শনের প্রবর্তক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, যার নামকরণ করা হয়েছিল, 'সরকারবাদ'।

১.১ সরকারবাদ ঃ এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

সরকারবাদ মূলত এমন এক নীতি যেখানে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষমতা ও শক্তির জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বহ যুগ ধরে চলে আসা ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে মুছে ফেলে, কোনো পক্ষপাত ছাড়াই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে। দুই সভ্যতার মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও, তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ যে এতদিন ধরে একরৈখিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সরকার। সরকারবাদ কে মূলত একধরণের দর্শনভিত্তিক আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করা যায়, যা সৃষ্টি করেছিল ঔপনিবেশিক প্রাচ্য নীতি, ভারততত্ত্ব ও আত্মস্বার্থবিশিষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার মধ্যে দিয়ে। এই ভাবেই সরকারবাদ সকল নির্যাতিত ও নিপীড়ত রাষ্ট্রের জন্য প্রগতির এক দর্শনের খসড়া তৈরী করেন, ও তার সাহায্যে পরবর্তীতে সামাজিক সমস্যা অনুধাবনের জন্য এক ধরণের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির নকশা তৈরী করেন। এই নকশাই ভারতের সামাজিক সমস্যার বিশিষ্টতা তুলে ধরতে ও তার যথার্থ সমাধান খুঁজতে সক্ষম হয়।

কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ, সরকারকে মানুষ সে ভাবে আর মনে রাখেনি, আর সেই কারণে বিনয় কুমার সরকারের নাম ভারতবর্ষের আধুনিক কালের কোনো পাঠ্য বইতে জায়গা করে নিতে পারেনি (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯১)। পশ্চিম বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাইরে আর কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয় সরকারকে নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক পাঠ্যক্রমে, সেইরকম আগ্রহ দেখা যায়না (নাগালা ঃ ২০০৮)। তবে সরকারবাদকে নিয়ে এই অনাগ্রহের কারণ বোধয় কিছুটা তিনি নিজেও। সরকার বহু বিষয় নিয়ে বিদ্যা চর্চা করেছেন এবং অসংখ্য ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছেন। ১৯১৪-১৯২৫ সালে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম বিশ্ব পরিক্রমায় বেড়িয়ে বিশ্বের নানান প্রান্তে ভ্রমণ করেন যেমন জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, যুক্ত রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সফর করেছেন এবং সেইসব সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নানা ভাষায়, যেমন ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং ইতালির ভাষায় ওঁর দক্ষতা থাকার ফলে, নিজের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যা চর্চাকে আরো সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত করতে ওঁর সুবিধা হয় (মুখোপাধ্যায় ঃ ১৯৭৯ ঃ ২১৪) ওঁর এই জ্ঞানের ব্যাপ্তি, বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য তাঁকে নানান বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানপিপাসু করে তোলে, যেমন শিক্ষা, নৈতিকতা, রাষ্ট্র, জাতি, শ্রেণী,

সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম, জাতি, জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য, অপরাধ, উন্নতি ইত্যাদি। আসলে উনি কখনই সেভাবে তার সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বকে সুসংগঠিত ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর নিজের বক্তব্য পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার থেকে উনি অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন তার সমকালীন চিন্তাবিদদের তাত্ত্বিক অপর্যাপ্ততাগুলিকে তুলে ধরতে। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর যে ধারণা, সেগুলিকে কখনোই একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেয়া সম্ভবপর হয়নি সরকারের পক্ষে (ব্যানার্জী: ১৯৭৯)।

২. সাম্প্রতিক গবেষণা

অমল মুখোপাধ্যায় (১৯৭৯), ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৪) এবং স্বপন কুমার ভট্টাচার্য (১৯৯০) ভারতীয় সমাজ তত্ত্বে সরকারের অবদান ব্যাখ্যা করেছেন। তার বাইরেও সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় সরকারের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁর তত্ত্বের মধ্যে নতুন কোনো ধারণার সূত্র পাওয়া যায় কি না, তার খোঁজ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন, বানেশ্বর দাস (১৯৪০), সুহৃতা সাহা (২০১৩), অঞ্জন ঘোষ (চ্যাটার্জী ২০১০ ঃ ৩৮) প্রমুখেরা। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২ ঃ ১৯২) দেখিয়েছেন যে কিছু সাম্প্রতিক গবেষক, সরকারের লেখাপত্রে এমন একটি নিশ্চিত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের হদিশ পেয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে সমাজতত্ত্বে তাঁর মুখ্য অবদান হিসাবে বিবেচিত হবে। এই তত্ত্ব আসলে মোটের উপরে ভারতবর্ষের এক প্রগতির তত্ত্ব, যার দুটি দিক আছে; একদিকে যেমন সরকার, ভারতবর্ষের দৃষ্টিবাদী/বস্তুবাদী সভ্যতা এবং অতীতের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতের 'charaiveti' বা 'চরৈবেতির' যে আদর্শের অনুসরণ করা হতো, তার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে উন্নত প্রগতি এসেছিলো। অন্যদিকে আবার তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশের উন্নয়নের পথে অনেক বাধা বিপত্তি এসেছে, কিন্তু যে কোনো অন্য সভ্যতার মতো এখানেও দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা আছে; তবে এই সব সরকারকে হতাশ করেনি। কারণ ওঁর মনে হয়েছে যে এই তত্ত্বের গোড়ার কথা হল 'সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা, যার জন্ম হয়েছে এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার থেকেই, এবং যা অবশেষে এক সৃজনশীল ভূমিকা পালন করে প্রগতির জন্ম দিয়েছে, এই ভাবেই সরকারের তত্ত্ব আধুনিক মনস্ক হয়ে উঠেছে।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন যে সরকারে তত্ত্ব, পশ্চিম বাংলা ছাড়া দেশের অন্যত্র বিশেষ জায়গা করে নিতে পারেনি, এটা সত্যি দূর্ভাগ্যের যে, সরকারের মতো একজন সমাজতাত্ত্বিক ক্রমশ বিদ্যা চর্চার জগৎ থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। একদা যাঁর কাজ-কর্ম নিয়ে প্রচুর পুনরালোচনা, পুনর্বিচার বা রিভিউ হয়েছে শুধু এই রাজ্যে নয়, দেশে বিদেশে সর্বত্র। Aubrey O 'Brien (১৯১৭), Raymond Firth (১৯৪২), E. B. Reuter (১৯৩৮), Bessie C. Randolph (১৯৩০), Norman E. Himes (১৯৩০) প্রমুখরা ওঁনার কাজের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, কিন্তু তাঁকে নিয়ে আজ আগ্রহের এত খামতি দেখলে সত্যিই অবাক লাগে। সরকার ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন কারণ ওঁনার মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশভক্তি অন্তর্নিবদ্ধ ছিল। অল্পবয়সে তিনি দেশের জন্য অনেক সমাজ সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নিয়েছিলেন নিঃস্বার্থ ভাবে, এবং এটাই পরবর্তী কালে তার জীবন ও বৌদ্ধিক চর্চার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদি আমরা ওনার জীবনীর একটি রূপরেখা অনুসরণ করি।

৩. জীবনী

সরকার ১৮৮৭ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর উত্তর বঙ্গের মালদা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বরাবরই এক অত্যন্ত মেধাবী ও উজ্জ্বল ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসে বিষয় নিয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হন। স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় ঈশান বৃত্তি লাভ করে। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মানিত পদটির জন্য মনোনীত হলেও তিনি কিন্তু সেটি প্রত্যাখ্যান করেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল; যার ফলে এই পদে যোগদান না করে ১৯০৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ যোগদান করেন সাম্মানিক অধ্যাপক হিসাবে। সেই সময় তিনি জাতীয়তাবাদের জনক, সতীশ চন্দ্র মুখার্জীর শিষ্য ছিলেন এবং ডন সোসাইটির সক্রিয় সদস্যও ছিলেন যার গোড়াপত্তন করেছিলেন স্বয়ং সতীশ বাবু। সরকার অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠতার সাথে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগের জন্য প্রচার করতে লাগলেন সর্বত্র। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের লক্ষ্য অনুসরণে, অর্থাৎ জনগণের মধ্যে শিক্ষার জাতীয়তাবাদী ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করার উদ্দেশে, সরকার মালদা জেলায় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করেন এবং এক সাথে একাধিক জাতীয়তাবাদী বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। অন্যদিকে, তার বন্ধু, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক রাধাকমল মুখার্জীর সাথে যৌথ ভাবে একটি তহবিল গড়ে তোলেন, বাংলার মেধাবী ও দুস্থ ছাত্রদের অর্থ সাহায্য করার জন্য যাতে তারা সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারে (ব্যানার্জী ঃ ১৯৭৯)। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, এবং একই সাথে যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা সংসদের সাথেও নিবিড় যোগাযোগ রেখেছিলেন। এই সময় তিনি মালদায় অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং জাতীয় শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা তৈরী করেন। তিনি বাংলা ভাষার ব্যবহারের তীব্র সমর্থক ছিলেন এবং মাতৃ ভাষায় বিদালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সূচনার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন।

সরকারের বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে তীব্র জাতীয়তাবাদী প্রবণতা নজর কাড়ে, বিশেষ করে তাঁর লেখা লেখির মধ্যে দিয়ে এই প্রবৃত্তি আরো বেশি করে প্রকাশ পায় । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগ উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায় ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সরকারের 'National Education in Bengali Nation' (Amrita Bazar Patrika, July, 31, 1906), শীর্ষক বইটিতে এবং 'সাধনা' (১৯১২) নামক প্রথম বাংলা ভাষায় সংকলিত প্রবন্ধগুচ্ছে। এই সময় থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল যে জাতির নির্মাণের প্রয়োজনে এমন এক আদর্শের দরকার যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং যার জন্য কোনো মধ্যস্থতা বা বাহ্যিক হস্তক্ষেপের দরকার হবে না, মানুষ নিজে থেকেই এই সংগ্রামে যোগদান করতে রাজি হবে, তাদের উপর বল প্রয়োগের প্রয়োজন করবে না, বন্দ্যোপাধ্যায় এই আদর্শকে বলেছেন'সৃজনশীল আদর্শবাদ' (২০১২ ঃ ১৯৩)। সরকারের এই আদর্শবাদের গোড়ার কথা হল মানুষের সৃজনশীল প্রাণশক্তির উপর গভীর আস্থা রাখা। 'মানুষের দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়', এই মন্ত্রের দ্বারাই সরকার সমস্ত প্রকারের হতাশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ

কে রোধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার আগে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বড় পরিবর্তন আনা। সরকার মনে করতেন ব্রিটিশ শাসকেরা একটা বড় পরিবর্তন এনেছেন ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আদলে ভারতীয়রা ত্যাগস্বীকার, সেবা, মানবপ্রীতিকে নতুন ভাবাদর্শে দেখতে শিখেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ, পাশ্চাত্যের সাথে তাঁর নিজের দেশজ ভাবনা চিন্তার মিল-মিশ ঘটানো। ভারতীয়রা কোনো অংশেই কম নয়, পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করে নিজের সমাজের বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। সরকার এই মন্ত্রেই সকলকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের এটাই উৎস স্থল বলে তিনি মনে করেছেন।

ভারতীয়দের পক্ষে কাম্য ছিল বৈজ্ঞানিক সত্তা, সাংবিধানিক স্বশাসন, রাজনৈতিক ঐক্য এবং পাশ্চাত্য জীবনের অন্যান্য উপাদানের সাথে নিজেদের বিশেষ জাতীয় অবস্থানের মেলবন্ধন ঘটানো। কিন্তু সব থেকে জরুরি হলো দেশবাসীকে দৃষ্টবাদী ও মানববাদী আদর্শবাদের দ্বারা পুনরুদ্দীপ্ত করা। এই জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তিনি সারা জীবন বজায় রেখেছিলেন; যদিও কখনোই তিনি সক্রিয়ভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি (বন্দোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৪)।

৪. ভারতের ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ (Interpretation of Indian tradition)

প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে বিনয় সরকার জাতীয়তাবাদের স্বার্থে কাজ করে গেছেন এবং মানুষকে স্বাধীনতাবাদী আবেগে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং উনি যে ধরনের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে, তা নিঃসন্দেহে দেশাত্মবোধক ভাবনায় পরিপুষ্ট। দেশের মুক্তির মধ্য দিয়েই উনি সার্বিক উন্নতির চিত্র এঁকেছিলেন। বিনয় সরকারের সমাজতত্ত্বকে জাতীয় উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব হিসাবেও দেখা যায়। সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে উনি বিশেষ ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নয়নের পথ খুঁজে ছিলেন এবং বাংলার কথা ভেবেছিলেন। বিনয় সরকার মনে করেছেন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে, একটি চিরন্তন দ্বন্দ্ব হল সনাতন ও আধুনিকতার মধ্যে সঠিক পন্থাটি বেছে নেওয়া। এই নির্বাচন সহজ নয়, কারণ এর মধ্যে মতান্তর রয়েছে প্রচুর। ঔপনিবেশিক সময় কালে, বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে, যে প্রশ্নটি চরম হয়ে উঠেছিল, সেটি হল, ভারতবর্ষের কি উচিত অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিকীকরণের নকশাকে অনুসরণ করে চলা? নাকি প্রথাগত জীবনযাপনের মধ্যেই আটকে থাকা? বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, একটি তৃতীয় বিকল্প উপায় হল এই দুটি মেরুর মধ্যে একটা সমঝোতায় আসা। এই প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমেই আমরা সরকারের সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোটিকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করব (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৪)।

৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য

এই বিষয়ে সরকারের মধ্যে আমরা একটা দ্বন্দ্ব অনুভব করি। অর্থাৎ, প্রথম দিকের আলোচনার মধ্যে তিনি প্রাচ্য ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে এক প্রশান্ত, শান্তিপূর্ণ, নিবিড় ধ্যানমগ্নতা দেখেছেন, যা পরবর্তীকালে তার চিন্তার মধ্যে আর স্থান পায়নি। সুতরাং প্রথম দিকে অন্যান্য প্রাচ্যবাদীদের মতো সরকারেরও মনে হয়েছে যে ভারতীয় সমাজ অন্যান্যদের থেকে পৃথক, এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা যথেষ্ট

প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ। এই পার্থক্যকে তিনি সিদ্ধতা দিয়েছেন নানান লেখা লেখির মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে। এই বিষয়ে সরকারের চিন্তার মধ্যে আমরা একটা স্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি। একদম প্রথমদিকে, যখন তিনি নানান প্রবন্ধ লিখছিলেন, 'সাধনা' প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হওয়ার জন্য তখন তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেকটি জাতি ও সমাজ একটি নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখে এবং বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই নিদিষ্টতা মেনে চলে। সুতরাং এক সামাজিক ব্যাধির জন্য প্রস্তাবিত ঔষধ কখনোই অন্য আরেক সমাজে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, সঠিক নিরাময় নির্দেশ করার আগে সেই সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাথায় রাখতে হবে (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৪)। পঠন-পাঠন, আর্থ-সামাজিক প্রসারণ, রাজনৈতিক অনুসন্ধান, যাই হোকনা কেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতীয় নেতারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন অন্ধ ভাবে পাশ্চাত্যের আদর্শকে নকল করার জন্য। সরকার মনে করেছেন এমন নির্দেশিকা ঠিক নয় কারণ নিজস্ব অভিন্নতা ও অতুলনীয়তার কারণে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে সম্প্রীতি সম্ভব নয়, তাই দু ধরণের সভ্যতার মধ্যে তারতম্য থাকাটা শুধু বাস্তব সত্য নয় প্রয়োজনীয়ও বটে। সরকার, অবশ্য মনে করেছেন যে, এই দেশনায়করা হয়তো ভুলে গেছেন যে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে একটা বুনিয়াদি পার্থক্য ছিল, বিশেষ করে আদর্শ, প্রতিষ্ঠান এবং সভ্যতাকে ঘিরে [বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৪ (Sarkar, 1912; Sarkar, 1914)]

সরকার অবশ্য এই পৃথকিকরণকে মেনে নিলেও, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেননি। উনি বলেছেন যে এই সংস্কৃতি বস্তুবাদী প্রবণতাকে এত উৎসাহ প্রদান করে বলেই, এখানে নান্দনিকতা, সৌন্দর্যতাত্ত্বিকতা ও স্নিগ্ধতার কোনো জায়গা নেই। এই সভ্যতা মানুষের মধ্যে লোভ, লালসা, উচ্চাশা ও লিপ্সা তৈরী করে যা কখনই সমাজের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির উদ্রেক ঘটাতে পারবে না। ফলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভাজন দেখাতে গিয়ে উনি একইসাথে এক ধরণের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ খুঁজেছেন। প্রাচ্যের ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সব সময় তাকে এগিয়ে রেখেছেন পাশ্চাত্যের তুলনায়। সুতরাং এই ভাবে বিনয় সরকার একাধারে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্যের নিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদী সভ্যতার পৃথকীকরণ করেছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য সমাজ মনে করে যে সভ্যতার মুল লক্ষ্য হল বস্তুবাদী স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতিই মানব জীবনের চূড়ান্তপর্ব, এর উর্দ্ধে আর কিছু নেই। সুতরাং পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে মানুষ তার জীবনের চরম উপলব্ধি ঘটাতে পারে পার্থিব জগতে তার কাজকর্ম ও অর্থনৈতিক পরিষেবার মাধ্যমে। সরকার মনে করেছেন জীবনের প্রতি এই জাতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি সঠিক নয়, এবং ঠিক এই কারণেই পাশ্চাত্য সমাজে এত সমস্যা দেখা যায় যেমন শ্রেণীদ্বন্দ্ব, হিংস্রতা, অনৈক্য এবং বিরোধিতা (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৫)। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেনি এবং মানুষের চির মুক্তি আসেনি। সে শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেও, তার মনের প্রশান্তি আসেনি। সে চিরকাল একধরণের অস্থায়ীত্ব, অশান্তি ও অস্থিরতাকে সঙ্গী করে সংসার বেঁধেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও তিলকের মতো সরকারও মনে করেছেন যে পাশ্চাত্য সমাজে অধ্যাত্মবাদের দুর্বলতার কারণেই পাশ্চাত্য সমাজে এই করুন পরিণতি নেমে এসেছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২ ঃ ৮)।

৫.১ 'ভারত' ও 'হিন্দু' একে অপরের পরিপূরক

সরকার যখন ভারতীয় সমাজের কথা বলেছেন তখন উনি আসলে হিন্দু সভ্যতার কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ যে সরকারের কাছে ভারত ও হিন্দু সভ্যতা ছিল এক অপরের সমার্থক। ভারতীয় সভ্যতার প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে উনি সর্বদা হিন্দুদের নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন যা ওনার ব্যক্তিত্ব, প্রগতি বা ঐতিহ্যের তত্ত্বে খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পরেছে। পূর্বের সাথে পশ্চিমের তুলনামূলক বিশ্লেষণের সময়, উনি আসলে পাশ্চাত্যের সাথে হিন্দু সভ্যতা ও তার সংস্কৃতির কথাই মূলতঃ বলে গেছেন। প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত বুনিয়াদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি দেখিয়েছেন যে হিন্দুরা কখনোই তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং সামাজিক জীবনের অন্যান্য বিভাগগুলিকে ভুলে যায়নি। হিন্দু সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, প্রত্নতত্ত্ব, ইত্যাদিগুলি সরকারের মতে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। হিন্দুদের কৃতিত্বের নিরিখেই সরকার ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত শিল্প বিপ্লবের প্রথম পর্বের সাথে ভারতবর্ষের তুলনা করেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশকে কোন দিক থেকেই খাটো করা যায় না, কিন্তু এই বিপ্লবের সাফল্যের পরেই দেখা যায় যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে। তবে, সরকার আবার এও বলেছেন যে, হিন্দুদের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বলেই, আজ আমাদের দেশ যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই এত অগ্রসর হয়েছে। স্বপন কুমার ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, সরকারের দ্বারা প্রদত্ত "বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা" শীর্ষক বক্তৃতায় এই ধারণার আভাস পাওয়া যায় (ভট্টাচার্য ঃ ১৪৩)

বিনয় সরকারের তত্ত্বে 'ভারত' এবং 'হিন্দু' এই শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক; সুতরাং, যখন তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন আসলে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথাই বোঝাচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে সরকার মনে করেছেন যে প্রাচীন যুগে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল কারণ হিন্দুরা, ধর্ম ও আধ্যাত্মবাদকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল। হিন্দুরা কখনই কামুক, কিংবা ভোগবিলাসী জীবনে বিশ্বাসী ছিল না। তারা বরং এই জাগতিক সীমাকে অতিক্রান্ত করে ঈশ্বরের সাথে অনন্ত যোগাযোগ রক্ষা করতে চেয়েছে। হিন্দুদের এই ধর্মীয় প্রবণতা, যোগাযোগের এই পথকে আরো মসৃণ করে তুলেছে, যার ফলে ইহ জগতের উর্দ্ধে গিয়ে এক অনন্ত উপলব্ধি সম্ভবপর হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৫)। এর সাহায্যে জাগতিক অসাম্য, দ্বন্দ্ব, উচ্চাশা এবং সাফল্যের মতো বিষয়গুলি, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই আধ্যাত্মবাদের মধ্যে দিয়েই হিন্দুরা সর্বদা অসীমের মধ্যে সসীমকে খোঁজার চেষ্টা করেছে। অতএব, পাশ্চাত্যের নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তিকে অসম্মান না জানিয়ে সরকার দৃঢ় ভাবে আমাদের সভ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে আদর্শবাদ, অধ্যাত্মবাদ এবং নিগূঢ় সত্তার দ্বারা [(Sarkar; 1912; 45) (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২)]।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান

সরকার এত দিন যাবৎ যে পার্থকের আলোচনা করছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে, সেই ভাবনায় ধীরে ধীরে ছেদ ঘটতে থাকে। তিনি ক্রমে অনুভব করতে লাগলেন যে প্রাচ্যের সভ্যতা অনেকাংশেই পাশ্চাত্যের বলে বলীয়ান, এবং পাশ্চাত্য সমাজ নিজেদের যে গুণাবলীর জন্য অহমিকা প্রকাশ করে, সেগুলি প্রাচ্যের মধ্যে বহু দিন ধরেই নিহিত ছিল, কেবল সেগুলি প্রকাশ্যে আসতে পারেনি। চিন্তাবিদেরা প্রাচ্যের

সমালোচনা করতে এতোই ব্যস্ত ছিল যে তারা নিজেরা কখনোই হিন্দু সভ্যতার বলিষ্ঠ জায়গাগুলোর দিকে যথেষ্ট নজর দিতে পারেনি। এই উপলব্ধি সরকারের মধ্যে আরো তীব্র ভাবে অনুভূত হতে শুরু করে যখন শুক্রাচার্যের 'নীতিসার' শীর্ষক বইটার অনুবাদ করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, সরকারের প্রথম দিককার লেখাগুলি পড়লে মনে হবে যে বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ এবং তিলকের মতো তিনি ও প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের গুণগান করছেন, কিন্তু ১৯১০ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সেই সময়, এলাহাবাদে একটি সর্ব-ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী চলছিল, যেখানে যুবক বিনয়ের সাক্ষাৎ হয় প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্যোগপতি মেজর বামন দাস বসুর সঙ্গে। তিনি সরকারকে অনুরোধ জানালেন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের এক অন্যতম প্রাচীন পুঁথি, "শুক্রাচার্য নীতিসার", গ্রন্থটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে, যা "স্যাক্রেড বুকস অফ দি হিন্দুস সিরিজ" নামক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত হবে তাঁদের এলাহাবাদের কার্যালয় থেকে ১৯১৪ সালে সরকারের বইটি প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে এই প্রকাশনার সূচনা হিসাবে তার প্রখ্যাত রচনা, 'দি পসিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি' প্রকাশিত হয় চারটি খণ্ডে। প্রাচীন ভারতের উপর এই গভীর গবেষণা সরকারের জীবন দর্শনে এক আমূল পরিবর্তন আনে। সরকার হিন্দু সভ্যতার নিরপেক্ষ ও দৃষ্টবাদী ঐতিহ্যগুলোকে দেখতে শুরু করেন নতুন আলোকে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং কাঠামো সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন। তিনি বুঝতে আরম্ভ করলেন যে প্রাচীন সভ্যতাতে হিন্দুরা শুধু আধ্যাত্মবাদে নিজেদের নিমজ্জিত করে রাখত না, একই সাথে 'শক্তিযোগের' আরাধনা করত এবং আরো বিভিন্ন রকমের জাগতিক বা নশ্বর ক্রিয়াকলাপে ব্রতী থাকত (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ : ১৯৬)। উনি এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে ভারতীয় সংস্কৃতির যে নতুন চিত্র ওনার কাছে উঠে এসেছে তা হল; যুদ্ধপ্রিয়, পার্থিব জীবনপ্রেমী, রাজনীতিবিদ, হিংস্র এবং বলশালী ভারতীয় চরিত্র যা কোন মতেই নিষ্প্রভ কিংবা ইহ জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন নয় [বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ (মুখোপাধ্যায় ঃ ১৯৮৮ ঃ ২৯২)]।

সুতরাং দেখা যায় যে, সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দিকে যেমন অধ্যাত্মবাদ দেখেছিলেন তেমনি অন্য দিকে আবার বস্তুবাদি ও জাগতিক চরিত্রের আভাস ও পেয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আনা, নির্লিপ্ততা ও অযৌক্তিকতার অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছিলেন এগুলি আসলে ভ্রান্ত উপায়ে হিন্দু সমাজকে পর্যালোচনা করার কু-ফল। হিন্দু ব্যবস্থার জাগতিক ও পার্থিব বৈশিষ্ট দেখানোর জন্য সরকার, এই ব্যবস্থার এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, 'ব্রহ্মচর্যের' উল্লেখ করেছেন (ভট্টাচার্য ঃ ১৯৯০ ঃ ১৫৪)। সরকার "বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা" শীর্ষক বক্তৃতায়, ঋজুতার সাথে বলেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থার মধ্যে দৃঢ় ভাবে গেঁথে থাকা ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন যোগ ও আধ্যাত্মবাদের শিক্ষা দিত অন্য দিকে আবার বাস্তববাদী জীবনের সাথে সংগ্রাম করতে গেলে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন হয়, তার ও পথ দেখাতো। ভারতীয় ও বিদেশী প্রাচ্যবিদেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণার অবতারণা করেছিলেন সেখানে বলা হয়েছিল যে এই দেশে কেবল অধ্যাত্মবাদ, অধিবিদ্যা ও অতিজাগতিক ভাবনা চিন্তাই একমাত্র প্রকাশ পেয়েছে। সরকার তার বস্তুবাদী ও দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এই চিত্রকে আমূল বদলে দিয়েছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম, লোক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব, এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য প্রবৃত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর কথায়, "ভারতবর্ষ ঠিক

ততটাই দৃষ্টবাদী, যুদ্ধ-প্রেমী,' শক্তি যোগের অনুসরণকারী ও ঔপনিবেশিক, যতটা ইউরোপের চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়"। আবার ইউরোপ, ভারতবর্ষের মতোই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক "[বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ (মুখোপাধ্যায়; ১৯৪৪; ৩৬-৩৭)।

৫.২ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনৈক্যের মূল কারণ শিল্প বিপ্লব

ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ, প্রাচ্য সমাজের কেন্দ্র স্থলে রয়েছে আর অন্য দিকে পশ্চিম সংস্কৃতির মূলে রয়েচে জাগতিক বস্তুবাদ— এই জাতীয় বার্তা যে সমস্ত প্রাচ্যবাদ ও সমাজতাত্ত্বিকেরা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হেগেল, বার্কলে, মেইন, মার্কস, মুলার, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ। (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ ঃ ১৯৭)। তবে সরকারের মতে এই তত্ত্ব মূলত অ-ঐতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তিনি এইসব তাত্ত্বিকদের দ্বারা গঠিত তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে এগুলি আসলে অসম্পূর্ণ এবং বেঠিক। এই সমস্ত তত্ত্বই পশ্চিমের প্রযুক্তিবাদী উৎকৃষ্টতা থেকে উদ্ভুত হয়েছে, এবং এগুলি প্রাচ্যের সমালোচনা করতে সক্ষম হয়েছে কারণ পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনা অনেক আগেই ঘটে গেছে। শিল্পের অগ্রগতিকে পাথেয় করে, ইউরোপ একের পর একের দেশকে পরাজিত করে উপনিবেশে রূপান্তরিত করেছে, এবং এই অধিকরণের ক্ষমতার বশেই বিশ্বের প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়ে ইতিমধ্যেই তার ধ্বংসাত্মক লীলা শুরু করে দিয়েছে। এর পরবর্তী সময় থেকেই আমরা দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তারতম্য আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাচ্যের দেশগুলি তাদের রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে, ইউরোপের কাছে, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে নিকৃষ্ট বলে অভিহিত হতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের আগে এশিয়া ও ইউরোপ বাসীর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, বিশেষ করে তাদের জীবন দর্শন ও ঐতিহাসিক কৃতিত্বের দিক থেকে। শিল্পবিপ্লবের ফলেই পশ্চিমের দেশগুলি শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীরণের সুযোগ নিয়ে অনেক উন্নত হয়ে ওঠে। এই সময়, ঔপনিবেশিকতাবাদ আমাদের প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়, ফলে সভ্যতার মাপকাঠিতে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে পরে। সরকার বিশ্বাস করতেন যে এই অনুন্নতি অল্পদিনের মধ্যেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হবে যদি ভারতবর্ষ আধুনিক শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির হাত ধরে এগিয়ে যায়।

এইভাবে আমাদের দেশ সাময়িক অনগ্রসরতার থেকে বেরিয়ে এসে বস্তুগত অগ্রগতি লাভ করবে এবং এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে কৃত্রিম পার্থক্য তৈরী হয়েছে তা মুছে ফেলা সম্ভব হবে। বিদেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে, বিশেষ করে ১৯১৪ থেকে ১৯২৫ এর মাঝে উনি যে বক্তৃতাগুলি প্রদান করে ছিলেন সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমতার প্রতিষ্ঠা করা। এই তথ্য গুলির মধ্য দিয়ে তিনি 'বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক' এক পদ্ধতির আবিষ্কার করেন যেটি ওনার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান, এবং এই পদ্ধতির প্রয়োগেই তিনি "ফিউচারিজম ইন ইয়ং এশিয়া" (১৯২২) শীর্ষক বইটি লেখেন যা জনমানসে যথেষ্ট ছাপ ফেলে। বইটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তারপর থেকে John Dewey এবং Edwin Seligmaner-এর মতো সমাজ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে প্রাচ্যের বৌদ্ধিক জগতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করতেন (মুখোপাধ্যায় ঃ ১৯৭৯ ঃ ২১৪)।

৬. পদ্ধতিগত সমস্যা

বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, প্রাচ্যবাদী ও ভারততত্ত্ববাদীরা যে তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে তিনটি মৌলিক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, যেমন তুলনামূলক আলোচনার সময় সমরূপ শ্রেণীর আলোচনা থেকে বিরত থাকা; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতির প্রয়োগ না ঘটানো এবং সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শের মধ্যে পার্থক্য না দেখাতে পারার সমস্যা। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় এই দূর্বলতাগুলিকে এই ভাবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন (২০১২ ঃ ১৯৭)।

১. তাত্ত্বিকেরা কোন একটি সমরূপ শ্রেণীর বিষয় নিয়ে তুলনা করেননি। তারা ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর আধুনিক পশ্চিমি সভ্যতার সাথে প্রাচীন এবং মধ্য যুগীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার তুলনা করেছেন। এর ফলে প্রাচ্যের কুসংস্কারের সাথে বিদেশের যুক্তিবাদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তারা স্বাভাবিকভাবেই একদিকে পাশ্চাত্যের দৃষ্টবাদী, বস্তুভিত্তিক ও নিরপেক্ষতার প্রশংসা করেছেন এবং অন্যদিকে প্রাচ্যকে তার অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় ও অতি-জাগতিক বিকারগুলির জন্য ভর্ৎসনা করেছেন।

২. তারা পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করেন, সেই একই পদ্ধতির প্রয়োগ তারা প্রাচ্যের ক্ষেত্রে করেননি।

৩. ইউরো-আমেরিকাবাসী পণ্ডিতেরা প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। তারা প্রাচ্যের আদর্শগুলির সাথে পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনা করেছেন এবং একই রকম ভাবে উল্টো পিঠটাও দেখিয়েছেন। অর্থাৎ সরকার বলতে চেয়েছেন যে, তাদের তুলনামূলক আলোচনায় পদে পদে তুলনার কথা ভাবা হয়নি, এবং হয়তো সেই কারণেই এই ঘাটতি রয়ে গেছে [বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ২০১২ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৮ ঃ ৩০)]

সরকার তুলনামূলক পদ্ধতির এই ভ্রান্তিগুলি সংশোধন করে ফেলে হিন্দুদের জীবনে এক আমূল নতুন ধারার সংযোজন করেন। তিনি মনে করেছেন যে হিন্দুরা কখনো অতীতে নিজেদের সামাজিক জীবনের নিরেপেক্ষ বৈশিষ্টগুলি উপেক্ষা করেননি, বরং তারা পরম আগ্রহের সাথে তাদের ইহলৌকিক ও গতানুগতিক কাজগুলি সম্পাদন করে গেছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা হিন্দুদের এই যাত্রাপথের পাথেয় ছিল। সরকার লিখে গেছেন যে, হিন্দুরা সর্বদাই তুরীয় বিষয়গুলি নিজেদের গতিপথের পুরোভূমিতে রাখলেও, তারা কখনোই দৃষ্টবাদী চালচিত্রকে অবজ্ঞা করেনি। বরং অন্য ভাবে বলা যায় যে প্রত্যক্ষবাদী, নিরপেক্ষ এবং বস্তুগত ভিত্তিগুলির মধ্যে দিয়েই তুরীয়, আধ্যাত্মিক ও আধিবিদ্যক বিষয়গুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভারতের গতিমান ইতিহাসে।

সুতরাং, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা থেকে সরকার মানুষের মধ্যে এক মৌলিক ঐক্য স্থাপন করেছেন এবং বলেছেন যে মানবজাতি সর্বত্র সমান ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন একই রকমের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, যার ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দু প্রান্তেই ব্যক্তি একই ভাবে নিজেদের জাহির করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি সেই সমস্ত তত্ত্বগুলি নাকচ করেছেন যেগুলিতে মানুষের মধ্যে জাতি, অঞ্চল, জলবায়ু কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ করা হয়ে থাকে। সুতরাং সরকারের সমাজতত্ত্বের গোড়ার কথা হল মানুষ এবং তার সৃজনশীল আত্মপ্রকাশ।

৭. প্রত্যক্ষবাদীতা (Positivism)

সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলো "দি পসিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি", যার মধ্য দিয়ে মূলত শুক্রাচার্যের বক্তব্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারের এই বইতে হিন্দু সমাজতত্ত্বের নানা তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। এই তথ্যগুলি মূলত ভারতের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পর্যায়গুলিকে নির্দেশ করে। সুতরাং এই বইটি, আসলে হিন্দু সমাজের একটি বিবর্তনশীল চিত্র তুলে ধরে ও হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শীর্ষবিন্দুগুলিকে ছুঁতে চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষবাদী আলোচনা করতে গিয়ে, সরকার অবশ্য হিন্দু সভ্যতার ঐতিহাসিক বৃদ্ধির নিরন্তর প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে চাননি, কিংবা কোন কোন স্তরের মধ্য দিয়ে এই সভ্যতা আধুনিক ভারতবর্ষে এসে পৌছালো, তা নিয়েও আলোচনা করতে চাননি। উনি মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতিগত বিশিষ্টতা দেখেছেন, তাই নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন।

৭.১ ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতি

পসিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ডের বেশ কিছু ঐতিহাসিক অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলির বিন্যাস করা হয়েছে মূলত দুটি কারণেরর জন্য। প্রথমত, শুক্রাচার্যের নীতি এবং হিন্দু জীবনের তথ্যগুলি সঠিক পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের পর্যালোচনা করা হচ্ছে কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক উপায়ে। তবে এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি কারণ তামিল, প্রাকৃত এবং আরো অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় যথেষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ সম্ভব হয় নি, তা ছাড়াও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলিও অবিশ্লেষিত থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানে, বিশেষ করে ভাবমূলক কিংবা প্রায়োগিক বিজ্ঞানে, হিন্দুদের অবদান পর্যালোচনা করার জন্য, প্রাচ্যের বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোন কোন কৃতিত্বগুলি চোখে পরার মতো, সেগুলি চিহ্নিত করে নেওয়া উচিত। আসলে হিন্দুদের জাগতিক সংসার ও সমাজ নিয়ে গবেষণা করার অক্ষমতার ধারণা বহু প্রচলিত। তার সাথে এটাও মেনে নেয়া হয়েছে যে বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে কিংবা যেকোন পার্থিব বা স্থলজ বিষয় সম্বন্ধে হিন্দুরা সর্বদাই উদাসীন, তাই তাদের মধ্যে কল্পনাপ্রবণ মানসিকতা এবং স্থূল ও দূরবর্তী ভাবাদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। সরকার দেখালেন যে ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে যদি এই প্রচলিত ধারণাগুলিকে ভ্রমাত্মক ও কু-পর্যবেক্ষণের ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সমস্ত ভারত তাত্ত্বিকদের মনে রাখতে হবে যে পাশ্চাত্য রাজ্যগুলি, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, শিল্পে, কিংবা গণতন্ত্রে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা এক শতকের বেশি পুরনো নয়। সুতরাং যদি, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং প্রয়োগমূলক কলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে, হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা করা হয়, এবং শেষ কটি প্রজন্মের সাফল্য বা অগ্রগতিগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়, পক্ষান্তরে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তা ও বস্তুবাদী কৃতিত্ব, কোনো অংশেই পাশ্চাত্য সভ্যতার থেকে কম নয়। হিন্দু সভ্যতা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে এই ভ্রান্তি তার মূল কারণ হল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ এবং তার অশুদ্ধ প্রয়োগ। আসলে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তৈরী না করেই, তাকে বিশ্লেষণ করার প্রবণতাই এই অসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে বাধ্য করেছে।

৮. হিন্দু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুরীয় এবং প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণ

শুক্রনীতির সূচনাকে, সরকার, "পসিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি", বা হিন্দু সমাজতত্ত্বের হিন্দু চালচিত্র বলেছেন কারণ হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিতে তুরীয় ও প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণ দেখাতে গিয়ে, সরকার বুঝেছেন যে নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মসূত্র হিসেবে শুক্রাচার্য, বিশেষ করে হিন্দু বর্গে ব্যবহৃত নানান ধারণা যেমন ধর্ম, অর্থ, এবং কাম, যা মূলত মোক্ষ বিরোধী, তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং শুক্রনীতির যে কোনো পর্যবেক্ষণ আসলে অ-মোক্ষ, কিংবা অ-তুরীয় ও অ-অলৌকিক অর্থাৎ হিন্দু আর্থ সামাজিক ব্যবস্তার নিরপেক্ষ, জাগতিক, বস্তুবাদী এবং প্রতক্ষবাদী নানান উপাদান নিয়ে কাজ করাই শুক্রাচার্যের মূল লক্ষ্য।

হিন্দু সভ্যতার অলৌকিক ও অতি-জাগতিক বিষয় নিয়ে অনেক কথা আগেই কথা হয়েছে। বিগত কয়েক শতক ধরে এমন ধারণা বলবৎ ছিল যে হিন্দু সভ্যতা মূলত অ-অর্থনৈতিক এং অ-রাজনৈতিক, যদিও এই সভ্যতাকে প্রাক-অর্থনৈতিক ও প্রাক রাজনৈতিক পর্যায়ে ফেলা হয় নি, তবুও একটা প্রবণতা ছিল আমাদের সংস্কৃতিকে চরম বৈরাগ্যময় ও পারমার্থিক হিসেবে চিহ্নিত করার।

যদিও এটা অসত্য নয় যে হিন্দুদের অধ্যাত্মিক ও অ-নশ্বর জগতের প্রতি খানিকটা হলেও আগ্রহ ছিল, তবে এই কথাও সত্য যে, হিন্দুরা কখনোই তাদের প্রত্যক্ষবাদী পটভূমিকাটিকে ভুলে যাননি। আসলে এই প্রত্যক্ষবাদী, নিরপেক্ষ ও অ-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়েই তুরীয়, ধার্মিক ও অধিবিদ্যক বিষয়গুলি প্রকাশ পেয়েছিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক - ইতিহাসে। উপনিষদ, বেদান্ত এবং গীতার মতো গ্রন্থগুলি ভারতের প্রত্যক্ষবাদের দিকেই নির্দেশ করে। হিন্দুদের সাহিত্য, কলা, ধার্মিক চেতনা, শিল্পগত জীবন, রাজনৈতিক সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক অর্থনীতি সর্বত্র এই জাগতিক ও অতি-জাগতিক বিশ্বের মধ্যে সেতু বন্ধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ভাবেই হিন্দুদের আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সংস্কৃতি ও বিশ্বাস, ধর্ম ও বিজ্ঞান, জাতপাতের দ্বন্দ ও বৈদিক ঐক্য, নশ্বর ও অবিনশ্বরের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা চালান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা' কাব্যে, আমরা দেখি উনি কি ভাবে বিশ্বের চরম বৈপরীত্য ও দ্বৈত সত্যতার মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, "আনন্দ রূপম অমৃতম য়াদভিভাতি" ("Ananda rupam amritam yadvibhati"), অর্থাৎ, যে আনন্দময় অনুভূতির কোনো রূপ নেই, তা খুব শীঘ্রই রূপে পরিণিত হবে। সরকার বলেছেন "The joy which is without form must create, must translate itself into forms" (সরকার ঃ ১০৪)। কবিগুরুর বেশির ভাগ কবিতার এটাই উপজীব্য বিষয় ছিল, যা পরোক্ষভাবে হিন্দ সভ্যতার প্রত্যক্ষবাদী চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ভাবেই ভালো ও মন্দ, রূপ ও আত্মা ও সীমাহীন, জায়গা করে নিয়েছে হিন্দু সাহিত্যে ও সমাজে। এই প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে হিন্দু ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও। একটি জাতির পক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ঔষুধ, রঞ্জন শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ধাতুবিদ্যা, সামরিক বিদ্যা এবং আর্থসামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করা পদার্থবিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না। আমাদের গার্হ্যস্থ ব্যবস্থায় শিক্ষা অর্জন করে, দেশবাসীরা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ও প্রশাসনিক কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত থেকেছেন, শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এবং একই সাথে সংগঠনমূলক কাজে পারদর্শিতার ছাপ ফেলেছেন। এই

কারণেই ভারতবাসীর গর্ব শুধু নিজেদের দেশের মধ্যে থেমে থাকেনি, বরং নানান দেশে পাড়ি জমিয়েছে ও নিজেদের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং মানবিকতাকে তাঁরা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই একজন আদর্শ হিন্দু সম্রাট, দেশবাসীকে রক্ষা করেছেন, নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন, রাজস্ব সংগ্রহ করেছেন এবং আপন খুশিতে রাজপাট চালিয়েছেন। তবে এই ব্যবস্থাকে নিছক সংকীর্ণ, জড় ও অনুপযুক্ত বলে অবজ্ঞা করা যায় না, কারণ এখানেই জন্ম হয়েছে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসর মতো ঋষিদের, পাণিনি, চাণক্য, চন্দ্রকান্ত ও তর্কালংকারের মতো পণ্ডিতদের, মৈত্রেয়ী, অহল্যা বাই, রানী ভবানীর মতো নারীদের এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, শিবাজী, রঞ্জিত সিংহের মতো রাজাধিপতিদের। সরকার মনে করেন, এই ভাবেই আমাদের জাতীয় সভ্যতা প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য দিকে এবং বিভিন্ন চিন্তক ও চিন্তাবিদেরা আমাদের নানান সামাজিক সমস্যা মিটিয়েছেন ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে।

৮.১ হিন্দু সাহিত্যে প্রত্যক্ষবাদের ছাপ

প্রত্যক্ষবাদের ছাপ পেতে হলে, সর্বোপরি প্রচলিত ভ্রান্তকর ধারণাগুলোকে পরিত্যাগ করতে হলে, সরকারের মতে, ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি ও কলা-ইতিহাসের আরো বিশদে অনুসন্ধান প্রয়োজন। এছাড়াও, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংস্কৃত, দ্রাবিড়, প্রাকৃত এবং আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যের বিশ্লেষণ দরকার, অধিবিদ্যক ও নিরপেক্ষ, দুটি শাখাতেই এর প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং হিন্দু সাহিত্যের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য কাব্য, নাট্য, কথা, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম-সূত্র, এবং স্মৃতিগুলি খতিয়ে দেখা উচিত ভারতীয় ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক উন্নয়নের নথিপত্র হিসেবে। এগুলি বিশদে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে দর্শন, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদিতে কিভাবে মানুষের নিত্য জীবনের আলোচনা করা হয়েছে এবং কোন নিয়মের দ্বারা এগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের অসংখ্য রীতি, নীতি, উৎসব, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হিন্দুদের তুরীয় সাংস্কৃতিক ধারণাগুলি কিভাবে মানবিক, জাগতিক ও নিরপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পরবর্তী কালে জনপ্রিয় লোকনীতি ও লোকচর্চার মধ্যে নিবিষ্ট করা হয়েছে, সরকার তাই দেখিয়েছেন। এই সমন্বয় বহু পরম্পরা ধরে চলে আসা বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যেও দেখা যায় এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন হিন্দু উপাচার, মন্ত্র, বিবাহের নিয়ম, যৌথ পরিবার, ক্ষুদ্র শিল্প, গ্রামীণ সমবায়িকী ব্যবস্থা, ধার্মিক ক্রিয়া-কাণ্ড, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-কর্মের স্থাপন বা মণ্ডল— এই বিশাল প্রেক্ষাপটকেই জাগতিক ও অতি-জাগতিক বিশ্বাসের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সরকার, মহাকবি ও নাট্যকার কালিদাসের মহাকাব্য রঘু বংশের, কথা বলেছেন যেখানে হিন্দু সভ্যতার চিরন্তন রূপটি ফুটে উঠেছে। কালিদাস দেখিয়েছেন যে হিন্দু সংস্কৃতি আসলে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে 'ভোগ' এবং 'ত্যাগ', এই দুটির সংশ্লেষে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের প্রটেস্টান্ট গির্জার সমর্থকদের একটি বড় অংশ যেমন, প্রার্থনাসভা উপাসনার পদ্ধতিগত সরলীকরণ চেয়ে সক্রিয় হয়েছিলেন গোঁড়া ও নীতিবাগীশ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঠিক তেমনি উচ্চাশা, তার বিশাল প্রাণশক্তি, ইহ জাগতিক কর্ম কাণ্ডের উপর তার প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অসাধারণ রাজনৈতিক অবস্থান, তার দর্প, অভিরুচি ও আত্মতৃপ্তি, সমস্ত

কিছুই এই মহাকাব্যে উঠে এসেছে। একই সাথে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, অহিংসা, যোগ, অবিনশ্বর জগৎ এবং সাংসারিক বন্ধনের থেকে চির মুক্তির আকুতি এই চিত্রও অধরা থাকেনি এই মহাকাব্যের মধ্যে। হিন্দু সভ্যতার মধ্যে সংশ্লেষের সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে কাব্যের সেই পর্যায়ে, কালিদাস যখন তার নায়ককে দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করেন। রাজা নেপোলিয়ন, বিশ্ব বিজয়ের পর ত্যাগস্বীকারে ব্রতী হন এবং সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। সর্বস্ব হারিয়ে, একটা ছোট্ট মাটির পাত্র ছাড়া আর কোন ধন সম্পত্তির উপরেই ওনার আর দখল থাকে না। এই ভাবেই রঘু বংশের চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে কালিদাস হিন্দু সভ্যতার মধ্যে অবস্থিত জাগতিক ও অতি-জাগতিক ভাবনা ও তার প্রকাশের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যতানের ছবিটা তুলে ধরেছেন।

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন যে আগস্ট কোঁতের সাথে সরকারের মিল শুধু এই জায়গাতেই যে তাঁরা দুজনেই 'দৃষ্টবাদ' বা 'পসিটিভ' ধারনাটির একটি নির্দিষ্ট মান আছে বলে মনে করেছেন তাই ধারনাটির সাথে বৌদ্ধিক বৃত্তি, যথার্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষীকরণ, বিজ্ঞান ও ধর্মের আদান-প্রদান, ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করেছেন। কোঁতের মানসিক স্তরের বিবর্তন এখানে গ্রাহ্য হয় নি (ভট্টাচার্য ঃ ১৯৯০ ঃ ১৩৯)। সুহৃতা সাহা সরকারের প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতিবিজ্ঞানটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সরকারকে অনুসরণ করেই। তিনি বলেছেন, সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে সবচেয়ে বড় কাজ হল, একটি বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিবিজ্ঞানের নকশা করা যার গোড়ার কথা হবে, সমাজ ও বহির্জগতের প্রতি বাস্তববাদী ও আবেগপ্রবণতাবিহীন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা (ভট্টাচার্য ঃ ১৯৯০ ঃ ১৯৮)। এই পথে যেতে হলে, নতুন ভাবনা চিন্তা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন দরকার (সরকার ঃ ১৯২২ ঃ ৩০), এবং এটা তখনি সম্ভব হবে যখন একদল সমাজতাত্ত্বিক সামগ্রিক ভাবে গবেষণার কাজ করবে কোনো ভারতীয় মনোভাব বা অনুভতি ছাড়াই। আসল কথা হল আমাদের যে কোন সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় এগোতে হবে নির্লিপ্ত ভাবে, কোনো প্রাকনির্ধারিত ধারণা নিয়ে নয়, বরং ঠিক যে ভাবে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক বা দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ করে থাকি সেই ভাবে (সাহা ঃ ২০০৯ ঃ ১৩)। সুতরাং, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা আলোচনা করার সময় এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলে, কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, গোষ্ঠীর মানসিকতা বা তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিকে অন্যদের তুলনায় অনাবশ্যক ভাবে উৎকৃষ্ট মনে হবে না। এর ভিত্তিতেই সরকার তাঁর ব্যক্তিত্বের ধারণাটি করেছেন।

৯. ব্যক্তিত্ব (Personality)

বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে, সরকার মানবতার একটি বুনিয়াদি ঐক্যের কথা বলেছেন। সরকার তর্কের খাতিরে বলেছেন, যে মানবতা সর্বত্র সমান, এবং তা প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশেই, সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে একইভাবে প্রকাশিত করতে ইচ্ছুক। এই হেতু, সরকার সেই সমস্ত তত্ত্বগুলিকে নস্যাৎ করেছেন যেগুলি, জাতি, অঞ্চল, পরিবেশ বা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে সেগুলিকে নস্যাৎ করেছেন। এই তত্ত্বগুলি বিশ্বের সর্বত্রই যে মানুষ সমান বোধশক্তি, বিচারবুদ্ধি ও মেধা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, তাই সর্বত্র তাঁর সৃজনশীলতাও একইভাবে প্রকাশ পায় —এই বিষয়টি অস্বীকার করে। সরকার মনে করেন, মানবতার এই ঐক্য আসলে তাঁর সংগ্রামী চরিত্রের আড়ালে

প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং তার সাহায্যেই, মানুষ এই পৃথিবীকে পুনঃ-সৃষ্টি করে তার সৃজনশীল শক্তির দ্বারা। সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ, সভ্যতার প্রধান রসদগুলি যেমন, আগুন, শক্তি এবং জীবনের জন্য নিরন্তর আকুতি জানিয়েছে। সরকার এই প্রজ্জ্বলনকেই বলেছেন, 'শক্তি-যোগ'। মানুষের এই প্রাণশক্তিকে সরকার প্রশংসা করেছেন যা তাকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বৈরতন্ত্র এবং বিজ্ঞান, কলা, শিল্প ও দার্শনিক তত্ত্বে সমর্থিত ক্রীতদাসত্বের থেকে মুক্তি পাওয়ার চরম বাসনা জাগ্রত করতে উদ্যম যোগায়। মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টির মাধ্যমে অতীতের অপ্রয়োজনীয়, অমূলক, নিষ্প্রভ অধ্যায়গুলিকে ত্যাগ করে, নতুন সৃষ্টির সুখে মেতে ওঠে। বিশ্ব জয়কারী এই মানব ব্যক্তিত্বকেই, সরকার তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর আলোচনায়।

ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী হিসেবে মানুষের প্রথম কাজ হল পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে মানুষের ও সমাজের কল্যাণের প্রয়োজনে সঠিক রূপে রূপান্তরি করা। শুধু প্রকৃতি, অঞ্চল বা ভৌগোলিক অবস্তান, এই জগৎকে সুযোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে না, মানুষ ই পারে তার সৃজনশীলশক্তি প্রয়োগ করে বাহ্যিক জগৎকে বাসযোগ্য করে তুলতে। আবার শুধু গোষ্ঠী, আত্মীয়-গোষ্ঠী, জাতি বা সমাজ পারে না ব্যক্তিকে সমাজের আনুগত্য স্বীকার করাতে, একমাত্র মানুষের ব্যক্তিত্বই পুরোনো ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করে সমাজে পরিবর্তন এনে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই ভাবেই সমাজে নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটে ও স্থিতাবস্থার অবসানে নতুন আলোর সঞ্চার ঘটে (বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৯৮৪ ঃ ১৩)।

৯.১ ব্যক্তিত্বের নিরন্তর গতিময়তা

সরকারের সামাজিক তত্ত্বের একটি মৌলিক সূত্র হল ব্যক্তিত্ত্বের গতিশীলতার ধারণা। মানবিকতা আসলে অনন্ত গতি, ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার দ্বারা নির্মিত। মানুষের চরিত্রের একটি প্রধান দিক হল প্রকৃতি ও পরিবেশের পুনস্থাপন ও পুনর্মার্জন। তাই মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব কখনো স্থায়ী থাকে না, তার মধ্যে সর্বদাই এক ধরণের অস্থিরতা, স্থিতিহীনতা ও ভারসাম্যহীনতা কাজ করে। ঠিক এই কারণেই মানুষের মধ্যে সবসময় পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। ব্যক্তির এই আদিম চরিত্রের জন্য সে তার পারিপার্শিক পরিবেশকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে না, বরং তাকে সন্দেহের চোখে বিশ্লেষণ করতে চায়। এই জেদের জন্যই সে চায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে আমূল পাল্টে ফেলে নতুন করে সমাজ গড়তে, এবং এই কারণেই সে চেষ্টা করে স্থবিরতাকে ভেঙে ফেলে, তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে। এই উদ্দীপনাকে সরকার আখ্যা দিয়েছেন, 'দামালপনার চালিকাশক্তি' বা "the spirit of the naughty" বলে, এই প্রাণশক্তিই পারে মানুষকে এগিয়ে দিতে ও নিত্য নতুন বিপদের সামনে রুখে দাঁড়াতে।

সরকার বলেছেন আমাদের ব্যক্তিত্ত্বের মধ্যে 'বাধ্য' ও 'অবাধ্য' সত্তার সহাবস্থান দেখা যায়। ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীলরা সবসময় চায় বর্তমান স্থিতিতেই সমাজকে টিকিয়ে রাখতে এবং এই ব্যবস্থাকেই উৎকৃষ্টতম বলে মেনে নিতে। স্থিতাবস্থাকে সমর্থন জানানোর জন্য তারা সব রকমের যুক্তি দিয়ে এই পরিস্থিতিকে অনুমোদন জানাতে চায়। অন্যদিকে বিরোধী শিবির, সমাজে আমূল পরিবর্তন আনতে চায়। তারা অধিষ্ঠিত সত্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, তাকে অবিশ্বাস করে এবং তার সামনে এক গুচ্ছ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় তাদের সর্বদাই মনে হয় যে এই পরিস্থিতি ব্যক্তির জন্য অনুকূল নয়। এর থেকে অনেক বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ ব্যবস্থার

দাবিদার তারা, ফলে সমাজকে মৌলিক ভাবে পরিবর্তন করার প্রত্যয় আরো জোরদার হয়ে ওঠে তাদের মনে।

ব্যক্তির এই দুঃসাহসিক চরিত্রকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সমাজ যে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ ব্যক্তিও একই উপায়ে পারে সামাজিক পরিবেশকে শাসন করতে। এই কথা বলতে গিয়ে, সরকার, ডুর্খেইমের তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন, এমন কি মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণাকেও অমান্য করেছেন। মার্ক্সের তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজের অর্থনৈতিক উপাদান সামাজিক ব্যবস্থাকে চালিত করে। সম্পর্কটা অনেকটাই একরৈখিক হয় যখন উৎপাদন পদ্ধতির উপায়ের মালিকানার উপরেই সামাজিক সম্পর্ক নির্ভর করে। অর্থনৈতিক শক্তির ক্ষমতা এতটাই যে সামাজিক পরিবর্তনে, ব্যক্তির কোনো অবদান লক্ষ্য করা যায় না। ঠিক একইভাবে ডুর্খেইমের কথাও বলা যায়, বিশেষ করে যা তিনি শ্রম বিভাজন ও ধর্মের তত্ত্বে বলে গেছেন। ডুর্খেইমের সমাজ প্রদত্ত যৌথ বিবেকের প্রভাব ব্যক্তির উপর সে ভাবে পরে না বলেই মনে করেন সরকার, তিনি মনে করেন সমাজ ও ব্যক্তির যৌথ সম্পর্ক কার্যকরী থাকে যার ফলে দু পক্ষই একে অপরের উপর সমান জোর আরোপ করতে পারে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে, ব্যক্তি পারে নিজের ক্ষমতার বলে সমাজকে নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও আমূল পরিবর্তন করতে। ব্যক্তির সৃজনশীল ইচ্ছা ও বুদ্ধিমত্তা যে কোন অন্য শক্তির মতোই সমাজে পালাবদল আনতে পারে মার্কস কিংবা ডুর্খেইমের ব্যক্তিত্বের ধারণার থেকে, তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় মনে হয়েছে কান্টের 'নৈতিক ব্যক্তি' বা 'moral person' কিংবা ফরাসি দার্শনিক হেনরি বের্গসনের (১৯০৭), 'Elan vital এর ধারণা। এই সমস্ত তত্ত্বেই ব্যক্তির স্বাধিকার, ক্ষমতায়ন ও সৃজনশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি সবসময়ে চেয়েছে তার পারিপার্শিক পরিবেশের সাহায্য নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে এবং এই ভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার ব্যক্তিত্ব আপন খেয়ালে গড়ে উঠেছে, সমাজের অযাচিত চাপ ছাড়াই।

৯.২ ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন মসৃণ প্রক্রিয়া নয়ঃ সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতার গুরুত্ব

ব্যক্তিত্বের উপর সরকারের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে যায় ১৯৩৭ সালে ওঁর দ্বারা প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত, ধর্মের এক আন্তর্জাতিক সমাবেশে, তিনি ওঁর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এর মূল বক্তব্য পরে 'ভিলেজেস এন্ড টাউন্স অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্ন্স' শীর্ষক গ্রন্থে ১৯৪১ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। এই বইটির মূল বক্তব্য ছিল যে ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ নিখুঁত, নৈতিক, বিশুদ্ধ কিংবা সৎ চরিত্র নয়। মানুষ কখনোই ভগবান হতে পারে না, ফলে তার ব্যক্তিত্বকে অতিমাত্রায় মহিমান্বিত বা গৌরবান্বিত করার কোন অর্থ নেই। মানুষ তো রক্ত মাংসের জীব, তাই তার মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণাবলী না খোঁজাই বাঞ্ছনীয়। অমল মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "Man, after all, is not God, but is very much an animal of flesh and blood" (Mukhopadhyay : 1979 : 221)।

ফলে ব্যক্তির মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যা কখনোই সম্পূর্ণ নৈতিক নয়, এবং কোন দার্শনিক সেগুলির সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চাইবে না। সুতরাং ব্যক্তিত্বের উন্নয়নকে কখনোই উচ্চ মানের নৈতিক চরিত্রের অগ্রগতি হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। তার মধ্যে যে সব সময় নীতিমূলক অভিব্যক্তির সমাবেশ দেখা যাবে, তা না প্রত্যাশা করাই ভাল। নৈতিকতার সাথে সাথে, ব্যক্তির মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, শয়তানি, এবং

দামালপনাও একই সাথে লক্ষ্য করা যায়। এইগুলো নিঃসন্দেহে মানব চরিত্রের অশুভ দিক, কিন্তু এই দিকগুলি ব্যক্তির মানসিক গঠনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু মানুষের মধ্যে এই দুর্বলতাগুলো আছে, তাই সে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এগুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা ও আছে। দুষ্টকে অবদমিত করার নিদারুন চেষ্টা থেকেই, মানুষ যে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যায়, সেই যুদ্ধই তাকে নৈতিক প্রগতি এনে দেয়। ফলে মানুষ এমন একজন ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে সর্বদাই চায় নিরন্তর লড়াই করে নিজেকে নিখুঁত করতে। তার দুর্বলতার কথা সে নিজেই জানে, তাই অনবরত সেগুলির বিরুদ্ধে এই লড়াই চালিয়ে যায়। সে জানে এই দুর্বলতাগুলিকে সে অতিক্রম করতে পারবে না, তাই সেগুলিকে জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা কখনোই সম্ভব নয়। অবশেষে এই অসাধু বৈশিষ্ট্যের সাথেই সহাবস্থান করতে শিখে নিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাই ব্যক্তির লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই ভাবেই সে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলে, এবং মানসিক বিকাশের পথ খুঁজতে থাকে। এই যুদ্ধ অনন্ত ও বিরামহীন এবং ক্রমাগত এই যুদ্ধের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার জীবনে অগ্রগতির সুযোগ খুঁজে পায়। এই যুদ্ধে যখন জয় নিশ্চিত হয়ে যায়, ঠিক তখন আবার আর একটি বিপত্তি এসে আক্রমণ করে, এবং এই বিপদের হাত থাকে মুক্তি পেতে মানুষ আবার অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকে। সরকারের মতে, এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা যায় সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা বা "ক্রিয়েটিভ ডিসইকুইলিব্রিয়াম"।

তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রগতি একজাতীয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, যা অগ্রগতির পথকে আরো গতিময় করে তোলে। মানুষ আর সমাজের প্রগতি এভাবেই সুখ ও দুঃখ ভাল ও মন্দ, নৈতিক ও অনৈতিক গুনাগুনের মধ্যে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রক্রিয়াটি কোন একরৈখিক, সমরূপীয় ও এক রঙের বিষয় নয়, এর মধ্যে বিভিন্ন রং মিলে মিশে একাকার হয়েছে, যার ফলে নানান ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নৈতিকতা কোন নিস্তেজ বা নিরলস বিষয় নয়, এর মধ্যে অনেক স্তর ও অনু-স্তর রয়েছে যার মধ্যে অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই এই ব্যক্তিত্বের গঠন সম্ভব। তাই ব্যক্তিত্ব গঠনের একটা বড় উপাদান হলো দ্বন্দ্ব, যার সঠিক ব্যবস্থাপনাই মানুষকে এগিয়ে দিতে পারে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে। এই দ্বন্দ্ব আরো বেশি করে প্রয়োজন কারণ, কোন দুজন ব্যক্তির মতের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে না। এটা কোন জাত-পাত-ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক কারণের জন্য নয়, এই বৈচিত্রমূলত ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতার জন্য। সরকারের মতে কোন দুজন ব্যক্তি এক ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে অক্ষম, তাদের মধ্যে মতের পার্থক্য হতে বাধ্য। সাদৃশ্য ও মতৈক্য থাকলে, মানুষের ব্যক্তিত্বের অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়। আসলে একে ওপরের সাথে সর্বদা বোঝাপড়া থাকলে দ্বন্দ্বের আর কোন অবকাশ থাকবে না, ফলে এগিয়ে যাওয়ারও আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। মানুষ নির্লিপ্ত ও নিস্তেজ হয়ে পরবে এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার চালিকা শক্তি হারিয়ে ফেলবে। সরকার মনে করেছেন যে দুজন ব্যক্তি যখন সহমত পোষণ করেন, তখন ওনার সন্দেহ হয় যে নিশ্চয়ই কোন একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্যায় বা অবিচার হতে চলেছে।

এই অবস্থান থেকেই তিনি দার্শনিক প্রোটাগোরাসের কথা স্মরণ করেছেন। প্রোটাগোরাস একজন বিশিষ্ট গ্রিক দার্শনিক ছিলেন, তিনি মনে করতেন যে চরম সত্য বলে কিছু হয় না। মানুষ যাকে সত্য বলে ধার্য করবে, তাই অবশেষে সত্যের রূপ ধারণ করবে। ওনার একটি বিখ্যাত উক্তি হল, "Man is the measure of all things", অর্থাৎ সত্য একটি আপেক্ষিক বিষয় যা মানুষ নির্ধারিত করে স্থান, কাল, পাত্রের অনুসরণে। সেই

সময় প্রোটাগোরাসের এই অবস্থানটি অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কারণ দর্শন বিজ্ঞানে, সর্বদা জগতের বস্তুনিষ্ঠতার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে এবং মেনে নেওয়া হয়েছিল যে জাগতিক বিষয় সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ যোগ্য আর বাইরের বিষয়। সত্যর নির্মাণ ঘটে থাকে ব্যক্তির হাত ধরে, একনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা নয়, এই কথা স্বীকার করে নিয়ে সরকার আসলে প্রোটাগোরাসের তত্ত্বকেই মেনে নিয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ডে চরম ও চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু হয় না, বরং সমাজে একাধিক সত্যের সমাহার দেখা যায় যা বিচিত্র ও বিভিন্ন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, উনি আসলে কূটতার্কিকদের কথাই মেনে নিয়েছিলেন যে, সত্যের এক নিজস্ব গতি প্রকৃতি আছে যা নমনীয় এবং যা কখনোই আদর্শ বা নৈতিকতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

বিনয় সরকার মানুষের দ্বান্দ্বিক প্রগতির দ্বারা এতটাই আকৃষ্ট ছিলেন যে শুধু অন্তর্ব্যক্তিগত প্রেক্ষিতই নয়, আন্তর্ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্যের হদিশ পেয়েছেন (মুখোপাধ্যায় ঃ ১৯৭৯ ঃ ২২৩)। ওনার দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ধারণার মধ্যেই এর হদিশ পাওয়া যায়। মানুষের একক বা সংহত ব্যক্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর বরং মনে হয়েছিল যে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের নানান ধরণ দেখা যায়, যা একরূপী নাও হতে পারে। মানুষের মধ্যে আসলে বহু ব্যক্তিত্বের সমীকরণ প্রত্যক্ষ করা যায়, যা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিত্বের অনুসারী নাও হতে পারে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যে নানান ভূমিকা ধারণ করে, সেই প্রক্রিয়া অনুসরণে ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। নানান বিরোধী ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমীকরণ বা সমতাবিধানের মধ্যে দিয়ে, কোন এক নতুন ব্যক্তিত্ব রূপ নিতে পারে, তাই ব্যক্তিত্ব কোন ঋজু, একগুঁয়ে বা অনমনীয় ধারণা নয়, এটা একটি পরিবর্তনশীল ও অ-অনুমানযোগ্য বিষয় যার কোন নির্দিষ্ট রূপ থাকতে পারে না। ব্যক্তি নিজের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত অনুযায়ী, নতুন করে ব্যক্তিত্বের গঠন করতে পারে যা তার স্বভাবগত ব্যক্তিত্বের এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও নমনীয়তাই মানসিক প্রগতি আনার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করে। তাই শুধু বাহ্যিক জগতের স্বার্থে নয়, সে নিজের সাথেও নিজের অবিরাম এক সংগ্রাম চালিয়ে যায়, এবং নিজের যুক্তি ও অযুক্তি, বস্তুনিষ্টতা ও আবেগ, এই দ্বৈত সত্তার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিত্ত্বের গঠন ও পুনর্গঠন করে জীবন পথে প্রগতির অভিমুখে এগিয়ে যায়।

১০. প্রগতি (Progress)

সরকারের তত্ত্বে সাধারণ ভাবে মনুষ্যত্বের প্রগতি ও নির্দিষ্ট ভাবে ভারতীয়দের প্রগতির পথ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রগতি সংক্রান্ত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করে, সরকার আসলে প্রগতির তত্ত্বে কিছু নতুন সংযোজনা আনতে চেয়েছিলেন। বহু শতক ধরে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একটা নিকৃষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ ও হীন ধারণা মানুষের মনে আরোপ করা হয়েছে; এই ধারণার সত্যতা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন করেনি। সুতরাং সরকারের মনে হয়েছে অনুসন্ধান চালিয়ে এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা উচিত।

১০.১ প্রগতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত

গ্রিক দার্শনিক **হেগেল** মনে করেছেন যে বিশ্বের ইতিহাস আসলে পূর্ব থেকে পশ্চিমের অভিমুখে ধাবিত হয়। এই একরৈখিক গতিপথের শীর্ষে আছে ইউরোপ, যেটা আসলে সকলেরই গন্তব্য এবং যাত্রা পথের

গোড়ায় আছে এশিয়া, যাকে সভ্যতার আদিম পর্ব হিসেবে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের এই অহমিকা বোধ প্রাচ্যের পতন ও অমর্যাদার ধারণাকে আরো বলিষ্ঠ করে তোলে। এর ফলে সভ্যতার ইতিহাসে এশিয়ার জীবন যাত্রার সম্বন্ধে এক পক্ষপাতযুক্ত চিত্র দাঁড় করানো হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে। ভারতের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত কিছু ধ্যান-ধারণাকে---তার রাজনৈতিক কার্যক্রম ও চেতনা বোধ, কলা এবং সাহিত্যকে---হেগেল অত্যন্ত অমর্যাদার আলোকে দেখিয়েছেন, এই চিত্র আরো বেশি অনুমোদন জুগিয়েছে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশকে, সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছে যে ভারতবর্ষের শোচনীয় ও দুর্বিষহ অবস্থার উন্নতিসাধনেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দেশে কাজ করে গেছে। ইংরেজদের মধ্যস্থতা ছাড়া, কখনই ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভবপর হত না। ভারতের প্রসঙ্গে হেগেল আরো বলেছেন, যে এখানে, 'সাবজেক্টিভিটি' বা 'আত্মনিষ্ঠার' গোড়ার কথা হল প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মিলন, কিন্তু এখানে যুক্তিবিদ্যা, তর্ক বা সিদ্ধান্তের কোনো জায়গা নেই, ফলে চিন্তার স্বাধীনতা বা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততার কথা নাকি বলা হয়নি। পার্শিয়ার সাথে ভারতবর্ষকে তুলনা করে বলা হয়েছে, যে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মবাদের মধ্যে বিভাজনের কথা কিন্তু পার্শিয়ান সভ্যতায় বলা হয়েছে, অতএব এই সভ্যতা ভারতবর্ষের থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। হিন্দুদের সম্বন্ধে নানান অবমাননাকর মন্তব্য করে বলেছেন যে তারা অচল, অজাগতিক, অ-পরিবর্তনশীল, গোঁড়া, সংরক্ষনশীল ও বস্তুগত জীবনের প্রতি চরম উদাসীন। সুতরাং ভারতীয়রা কখনই নিজেদের সভ্যতাকে প্রগতির আলো দেখাতে পারবে না (Bhattacharya : 1990 : 6)। ম্যাক্স ওয়েবার ও একইরকমের ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব এবং যুক্তিগত পছন্দের সুযোগ ঠিক মত পায়না বলেই, হিন্দুরা জাত ব্যবস্থার শৃঙ্খলের মধ্যে বন্দি থাকতে বাধ্য হয়। কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মীয় আচার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনৈক্য, তন্ত্র ও জাদু বিদ্যায় বিশাস, নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা, ইত্যাদি দুর্বলতাই ভারতীয়দের অনেক পিছনে ফেলে রেখেছে। পাশ্চাত্যের আমলাতন্ত্র ও পুঁজিবাদের তুলনায়, ভারতবর্ষের অর্থনীতি জরাগ্রস্ত ও অনুন্নত; অতএব ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্যের মত যুক্তিসঙ্গত পুঁজিবাদ কখনই প্রসারিত হতে পারবে না। ফলে ইহজাগতিক বিশ্ব সম্পর্কে চরম উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা ভারতীয়দের মজ্জাগত।

এঁদের বাইরে অন্যান্যরাও ছিলেন যেমন ম্যাক্স ম্যুলার, যিনি হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ও অতি-জাগতিক বলে মনে করতেন। অন্য দিকে, বটমোরের ভাবনা চিন্তাও খুব বেশি ভিন্ন ছিল না এঁদের থেকে (ভট্টাচার্য ঃ ৪৬৮)। তিনিও মনে করেছেন, ভারতবর্ষে কখনই পরিবর্তন, বিবর্তন বা প্রগতিকে নিশ্চিত করার জন্য উর্বর বৌদ্ধিক বা সামাজিক পরিস্থিতি ছিল না। প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজে সম্পূর্ণ স্থিতাবস্থা তৈরী হয়েছে ও পরিবর্তনের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি; বরং জাতি, যৌথ পরিবার, গ্রামীণ সম্প্রদায়, ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য দেখা যায়। ইনিও মনে করেছেন যে ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে এখানে পশ্চিমি প্রযুক্তি ও প্রগতির কোন ধারণা পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্ম এমন এক ব্যবস্থা তৈরী করেছে যার ফলে বস্তুগত উন্নয়নের উপর থেকে মানুষের আকর্ষণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন সমাজে প্রগতির সুযোগ তৈরী হতে পারে না, এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি মনে করেছেন যে, যেখানে ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস গুলিকে খণ্ডন করে নিরপেক্ষ জীবন যাত্রার পরিবেশ তৈরী হয়নি। এনারা সবাই মনে করেছেন যে বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমাজ জীবন আসলে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা প্রদত্ত, এবং এখানে প্রাক ব্রিটিশ যুগের চিন্তা বিদদের কোন অবদান থাকতে পারে না।

১০.২ প্রাক-ব্রিটিশ সমাজে প্রগতির স্পষ্ট উপস্থিতি

সরকার দেখিয়েছেন যে প্রাক-ব্রিটিশ সমাজে, প্রগতির ধারণা সর্বত্র যথেষ্টই উপস্থিত ছিল এবং তা ভারতবর্ষকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। বেদান্তে বহুত্বের দৃষ্টিভঙ্গি, এই প্রগতির সূচকগুলিকে আরও স্বচ্ছ করে তোলে। ইতিহাসের অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে যে হিন্দু মনীষী ও ঋষিরা সর্বসাধারণের জন্য প্রগতির কথা ভেবেছেন, এবং তাদের মধ্যে শুধু অধিবিদ্যা ও ইহজগতের প্রতি আসক্তি দেখতে পাওয়া যেত, এই তথ্য ভুল। গীতায় উল্লেখিত প্রগতির যুগান্তর তত্ত্ব, আসলে প্রগতির এক চক্রাকার তত্ত্ব, যেখানে অশুভ শক্তির পরাজয়ের পরে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়া ঈশ্বরের মধ্যস্থতার ফলেই সম্ভবপর হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে, এক ধরনের সৃজনশীল, আধুনিক ও বিবর্তনমূলক শ্লোকের ব্যবহার দেখা যায় যা মানুষের প্রগতিশীল মনেরই পরিচয় দেয়। এই সংস্কৃত শ্লোকটি বস্তুনিষ্ঠার চূড়ান্ত পরিচয় দেয় ঃ

অসতোমা সদ্‌গময়।	(asato ma sadgamaya)
তমসোমা জ্যোতির গময়।	(tamasoma jyotir gamaya)
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥	(mrityormaamritam gamaya)
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তিঃ॥	(Om shanti shanti shantih)

এখানে অসত্য থেকে সত্যতা, অন্ধকার থেকে আলো, মৃত্যু থেকে অমরতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যুক্তিগত এবং মানবিক, এখানে কোন আধ্যাত্মিক ও অতিজাগতিক আকুতি লক্ষ্য করা যায় না। ভট্টাচার্য মনে করেছেন এই জাতীয় স্তুতি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষবাদী ও আশাবাদী, এখানে ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে (ভট্টাচার্য ঃ ৪৭১)। সুতরাং সরকার স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন যুগ থেকেই জড়বাদী, ইহলৌকিক ও পার্থিব জগতের স্তুতি করা হয়েছে এবং বলপূর্বক ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক ও অপার্থিব আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা সম্পূর্ণ অযাচিত ও অনৈতিক। বেদের উল্লেখ করে সরকার দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি কত পরিশ্রম করে এগুলির রচনা করেছেন, এবং প্রত্যেকটি স্তবকে এইরকম পরিশ্রমী রক্ত-মাংস মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে। ঋগ্ বেদে মানুষের সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে যা সে অবিশ্রান্ত ভাবে চালিয়ে গেছে জীবনের বুনিয়াদি রসদগুলি সংগ্রহ করার জন্য। ঋগ বেদে দেখানো হয়েছে যে মানুষ সর্বদা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একটি নিজস্ব ভূখণ্ড লাভ করতে চেয়েছে, যার উপর সে সংসার বাঁধবে ও নিরন্তর চেষ্টা করবে নিজেদের এলাকার প্রসার ঘটাতে। বৈদিক সমাজে হিন্দুরা এমনটাই সারা জীবন চেয়েছে, এবং তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। অথর্ব বেদেও পুরুষার্থের উল্লেখ রয়েছে, যা আসলে বাস্তবিক জগৎ সম্পর্কে মানুষের আসক্তিকেই আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরে। মানুষ সর্বদাই নিজেদের অবস্থানের উন্নতি চেয়েছে এবং স্তব ও স্তুতির মাধ্যমে নয়, বরং রুদ্র মূর্তি ধারণ করে, নিজেদের সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়ে, আগ্রাসী মানুষ এই পৃথিবীর বুকে নিজেদের বেঁচে থাকার চরম চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

D/Barun-2020/Netaji Subhas Open University/Introducing Sociology/Movel-IV/3rd Proof/05.04.22/26

১০.৩ ব্যক্তিত্ব ও প্রগতি

সরকার আসলে চেয়েছেন ব্যক্তিত্বের ধারণা থেকে প্রগতির ধারণায় পৌঁছতে। উনি দেখিয়েছেন যে মানুষ অবিরাম যুদ্ধ করে যায় নিজের মধ্যে, এবং এই অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সে চায় সামাজিক দ্বন্দগুলিকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে। এই ভাবেই সরকার সামাজিক প্রগতির তত্ত্বটিকে দাঁড় করানো চেষ্টা চালিয়েছেন। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রগতির বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি কখনো ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করতে বলেন নি। উনি মনে করেছেন প্রাচীন যুগ থেকেই ঐতিহ্যের মধ্যে এক ধরণের নিরপেক্ষতা বিরাজ করেছে যা কখনো উপেক্ষা করা যায় না। উনি এমনটাও মনে করেছেন যে ঈশ্বর আসলে মানুষের কল্পনাশ্রয়ী ভাবনা যার মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। তাই হিন্দু দেব দেবীদের তিনি হিন্দু মননের সৃজনশীল কল্পনা বলে মনে করেছেন। দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কালী, কৃষ্ণ, কার্তিক প্রমুখেরা আসলে হিন্দু পরিবার ব্যবস্থার চরিত্র মাত্র। এই ভাবেই তিনি হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠনগুলির মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতা ও পার্থিবতা আনার চেষ্টা করেছেন।

১১. উপসংহার

সরকারের ব্যক্তিত্বের ধারণা থেকে ম্যাকিয়াভেলীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তিনি দেখিয়েছিলেন যে মানুষের মধ্যে দানবিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সে কিছুতেই, কোনো পরিস্থিতিতে দেবতায় রূপান্তরিত হতে পারে না। ইউরোপে শিকড় বেঁধে থাকা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আসলে মানুষকে কোন কাজে এগিয়ে দিতে পারত না; সে ভীতু ও কাপুরুষ হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিত এবং সামনে এগিয়ে কোন দুঃসাহসিক কাজ করতে সক্ষম হতো না। ইউরোপীয় নবজাগরণ মানুষের মননে এই ভয় কে পরাস্ত করে এবং সেই সময়ে গড়ে ওঠা নতুন ব্যবসায়িক অর্থনীতি মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। এই ভাবেই মানুষের মধ্যে চিত্ত জাগরণ ঘটে ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজ পরিস্থিতির আমূল বিবর্তন ঘটায় যার ফলে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয়। দেশ-বিদেশের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয় যা সমস্ত গোঁড়ামি ও রক্ষনশীলতাকে ঘুচিয়ে দিয়ে, সমাজে এক নতুন বিপ্লব সূচিত করে।

মানুষ বুঝতে পারে শুধু অবিনশ্বর পৃথিবী নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, এক নতুন বস্তুবাদি পৃথিবী তার জন অপেক্ষা করছে যাকে বশে আনতে হলে নিজেকেই সাহসী, ক্ষিপ্র, চতুর, বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ হতে হবে, তাহলেই সদর্থে প্রগতি আসবে তার নিজের ব্যক্তিত্বে ও সমাজে। ম্যাকিয়াভেলীর ধারণা পরবর্তীকালে আরো দৃঢ় হয়েছে সপ্তদশ শতকে হবসের তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যেখানে তিনি বুর্জোয়া সমাজের গোড়াপত্তনে একজন সংগ্রামী ও সৃজনশীল ব্যক্তির ভূমিকা তুলে ধরেছেন। হবসের মতো সরকারও অষ্টদশ শতকে নব্য ভারতীয় শিল্প বুর্জোয়ার কথা চিন্তা করেছেন ও সমস্ত বাধা বিপত্তিকে পিছনে ফেলে সে কি ভাবে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাবে তার পথ নির্দেশ করেছেন। ইউরোপের উন্নতিশীল দেশগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের দেশের কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল এবং সর্বোপরি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের থেকে আসা প্রবল চাপ, যা আসলে দেশজ শিল্পগুলিকে প্রায় মৃত্যু মুখে ফেলে দিয়েছিল। তার ওপরে ছিল ভারতীয় বুর্জোয়াদের পরিচয়হীনতা, কারণ তখনো প্রাচ্যকে যোগ ও অধ্যাত্মবাদে নিমগ্ন থাকা একটি নির্লিপ্ত ও পিছিয়ে পড়া সভ্যতা বলেই মনে করা হতো। তাই পুঁজিবাদী মানসিকতার পথে প্রচুর বাধা বিপত্তি আসতে দেখা যায়।

তাই সরকার তাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্বকে সিদ্ধতা দিয়ে আসলে সেই লড়াইকেই অনুমোদন জানিয়েছেন যা আসলে পুঁজিবাদী মনন ও ব্যবস্থার প্রগতিকে অভিনন্দন জানাবে এই দেশে। এই রকম বুর্জোয়া ও লড়াকু মানুষ না হতে পারলে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের হাত ধরে বর্তমান অবস্থায় শিল্পোন্নয়ন আসবে না। ব্রিটিশ শাসকেরা যে ক্ষতি করে গেছে ভারতভূমিতে, তার সঠিক প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে এই সংগ্রামশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অনিবার্য। এই ভাবেই ব্যক্তিত্বের বিকাশের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রগতি তরান্বিত হবে।

১২. অনুশীলনী

1. বিনয় সরকারের অবদান আলোচনা করুন ভারতীয় সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে? (২০)
2. বিনয় সরকারের প্রগতির তত্ত্বটি বিশদে লিখুন। (২০)
3. বিনয় সরকারের ব্যক্তিত্বের ধারণাটির ব্যাখ্যা দিন। (২০)
4. সরকার কি ভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন? সরকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কি কোন পার্থক্য করেছেন?.....ব্যাখ্যা দিন। (১২)
5. সরকার কি ভাবে 'ভারত' ও 'হিন্দুর' মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন? (১২)
6. প্রত্যক্ষবাদ বলতে কি বোঝেন? (১২)

সংক্ষেপে উত্তর দিন।

7. প্রগতি বলতে কি বোঝেন? (৬)
8. সৃজনশীল ভারসাম্যহীনতা বলতে কি বোঝেন? (৬)
9. প্রত্যক্ষবাদের অর্থ কি? (৬)

১৩. রেফারেন্স/গ্রন্থপঞ্জী

Bandyopadhyay, Bholanath. (1984) *The Political Ideas of Benoy Kumar Sarkar* K. P. Bagchi, Calcutta, **ISBN 0-8364-1336-9,**

Bandyopadhyay, Bholanath. (2012) 'Benoy Kumar Sarkar' in Bholanath Bandyopadhyay and Krishnadas Chattopadhyay (edited), *Bharater Samajtattvik Chintadhara,* Levant Book, Calcutta.

Banerjee, Bholanath (1979) : The Sociological thinking of Benoy Kumar Sarkar in *Socialist Perspective-A Quarterly journal of Social Sciences,* Vol.6, No.4, March-May.

Sarkar, Benoy Kumar (1912) : The Pedagogy of the Hindus, Calcutta, Chuckervertty, Chatterjee and Co. Ltd.

---------- (1914) : The Positive Background of Hindu Sociology, BK. I, Allahabad, The Panini Office.

Bhattacharya, Swapan Kumar. 1990. Indian Sociology : The Role of Benoy Kuman Sarkar, Burdwan : The University of Burdwan.

CHATERJEE, P. (2010). In Memoriam : Anjan Ghosh. *Economic and Political Weekly, 45*(26/27), 37-39. Retrieved from http://www. jstor. org/stable/40736690.

Dass, Banesvar (1940), The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar. Calcutta : Chuckervertty and Chatterjee Co., Ltd., 1940. Pp. xix+664.

Firth, R. (1942). *Philosophy,* 17(66), 190-191. Retrieved from **http://www.jstor.org/stable/3747314.**

Himes, N. (1937). *The Annals of the American Academy of Political and Social Science,* 194, 227-228.

Retireved from **http://www.jstor.org/stable/1022171.**

Mukhopadhyay, Amal Kumar (edited), (1979), The Bengali intellectual tradition : from Rammohun Ray to Dhirendranath Sen K. P. Bagchi, Calcutta.

Mukhopadhyay, Haridas (1988) : Benoy Sarkar Boithake, 1st Volume, Kolkata, Chakraborty, Chatterjee and Co.

O'Brien, A. (1917). 122.*Man,* 17, 178-179. doi : 10.2307/2788670.

Randolph, B. (1930). *The American Journal of International Law, 24*(2), 439-440. doi : 10.2307/2189454.

Reuter, E. (1938). *American Journal of Sociology, 43*(5), 855-855. Retrieved from **http://www.jstor. org/stable/2768949.**

Saha, Suhrita. (2013), "Benoy Kumar Sarkar (1887–1949) : A Tryst with Destiny." *Sociological Bulletin* 62, no. 1 (2013) : 4-22. **http://www.jstor. org/stable/23621023.** ব্যানার্জী : ১৯৭৯).